ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ

পরিবার সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকে সমাজের উৎপত্তি। সমাজে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে পরিবার অন্যতম। মানুষের অকৃত্রিম ও নিবিড় সম্পর্ক এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। পারিবারিক জীবনের সূচনা থেকেই প্রতিটি মানুষকে গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে হয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন অথবা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বন্ধন ও কার্যকলাপের সমন্বয়ে আমাদের পারিবারিক কাঠামো গড়ে ওঠে। পরিবারভেদে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে এ উল্লেখিত সম্পর্কগুলো লক্ষ করা যায়, যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মানুষ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে এবং সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলে। এই খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ, যা মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করে এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার পরিবারের ধারণা ব্যাখা করতে পারব;
- পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা সম্পর্কে জানব;
- সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ গঠনে সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হব।

পরিচ্ছেদ ১৩.১: বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো

বাংলাদেশে মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিবারেই বড়ো হয়। মানুষের জন্ম, সমগ্র কর্মময় জীবন এবং শেষ পরিণতি পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানব সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে পরিবার নেই। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন, যেখানে পিতামাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের স্নেহ- ভালোবাসা, শাসন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে পরিবারেই শিশুর সকল সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে।

পরিবারের ধারণা

পরিবার হলো সমাজকাঠামোর মৌল সংগঠন। গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার। পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্বামীস্ত্রীর একটি স্থায়ী সংঘ বা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সন্তানসন্ততি থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। অন্য সদস্যও থাকতে পারে।

বিবাহের মাধ্যমে সাধারণত পরিবার গঠিত হয়। বাংলাদেশে একজন পুরুষ সমাজস্বীকৃত উপায়ে একজন নারীকে বিয়ে করে একটি পরিবার গঠন করে। আদিম সমাজেও পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। সে সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হতো।

পরিবার হচ্ছে মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এটি আমাদের দলবদ্ধ জীবনের ভিত্তি। সন্তান জন্মদান, প্রতিপালন এবং স্নেহ-মায়ামমতার বন্ধন, মূল্যবোধ গঠন, অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি পরিবারে ঘটে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের রয়েছে বিশেষ নিয়ম-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং কার্যগত সাংগঠনিক ভিত্তি, যার সামগ্রিকরূপই পরিবার কাঠামো।

আদিম সমাজ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবারের গঠন, কার্যাবলি ও কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মানব সমাজে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, মানুষের জীবনের শুরু হতে শেষ অবধি আশ্রয়স্থল হচ্ছে পরিবার। পরিবারের সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর ও শৃঙ্খলিত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। পরিবারের মাধ্যমেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

পরিবারের প্রকারভেদ

সমাজভেদে বা দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের পরিবার রয়েছে। বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, কর্তৃত্ব, পরিবারের আকার, বংশমর্যাদা, বসবাস এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

১. **স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার :** এ ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন: একপত্নী, বহুপত্নী ও বহুপতি পরিবার। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের মাধ্যমে একপত্নী পরিবার গড়ে ওঠে। বিশ্বে এ ধরনের পরিবার অধিক দেখা যায়। আদর্শ পরিবার বলতে মূলত এ পরিবারকেই বোঝায়। এ ধরনের পরিবার কাঠামোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। আবার একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয়, তাকে বহুপত্নী পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মূলত একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে এ ধরনের বহুপত্নীক পরিবার দেখা যায়। এস্কিমো

জাতি এবং আফ্রিকার নানান গোষ্ঠীর সমাজেও এ ধরনের পরিবার প্রথা রয়েছে। একজন নারীর সাথে একাধিক পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে বহুপতি পরিবার বলে। তিব্বতে এ ধরনের পরিবার রয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ভারতের মালাগড় অঞ্চলে টোডাদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যেত।

২. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার : কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন–পিতৃপ্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পরিবারের সামগ্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুরুষ সদস্য অর্থাৎ পিতা, স্বামী কিংবা বয়স্ক পুরুষের হাতে থাকলে এ ধরনের পরিবারকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারের বংশ পরিচয় প্রধানত পুরুষ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার যে পরিবারের সামগ্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মায়ের হাতে থাকে সে পরিবারকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা খাসিয়া এবং গারোদের পরিবার মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রধান।

৩. আকারের ভিত্তিতে পরিবার : আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন–একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। স্বামী–স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান–সন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলে। এ পরিবার দুই পুরুষে আবদ্ধ। দুই পুরুষ হলো পিতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান–সন্ততি। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারই একক পরিবার। গ্রামাঞ্চলেও এ ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের পরিবার প্রথা প্রচলিত। যখন দাদা-দাদি বা পিতা-মাতার কর্তৃত্বাধীনে বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তানাদি এক সংসারে বাস করে তখন তাকে যৌথ পরিবার বলে। একক পরিবারের মতো যৌথ পরিবারের বন্ধনও মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের এখনও অধিকাংশ পরিবারই যৌথ পরিবার। এখন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে।

> **কাজ**
>
> দলগত : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে যে ধরনগুলো দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
>
> একক : তোমার এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিবারের ধরন চিহ্নিত করে একটি ছক তৈরি কর।

তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধনের পরিবার হলো বর্ধিত পরিবার। বর্ধিত পরিবারে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকের সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। চীনেও এ ধরনের পরিবার প্রথা রয়েছে।

৪. বংশমর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার : এ ভিত্তিতে পরিবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন–পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার। পিতৃসূত্রীয় পরিবারের সন্তান–সন্ততি পিতার বংশমর্যাদার অধিকারী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। মাতৃসূত্রীয় পরিবার মায়ের দিক থেকে বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করে। খাসিয়া ও গারোদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত।

৫. বিবাহোত্তর স্বামী–স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবার : এ ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়, যেমন–পিতৃবাস, মাতৃবাস এবং নয়াবাস পরিবার। যে পরিবারে বিবাহের পর নবদম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। আমাদের সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। বিবাহের পর নবদম্পতি স্ত্রীর পিতৃগৃহে বসবাস করলে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। বিবাহিত দম্পতি স্বামী বা স্ত্রী কারও পিতার বাড়িতে বাস না করে পৃথক বাড়িতে বাস করলে নয়াবাস পরিবার বলা হয়। শহরে চাকরিজীবীদের মধ্যে এধরনের পরিবার দেখা যায়।

৬. **পাত্র–পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবার :** মুসলমান সমাজে গোত্রভিত্তিক বিবাহের প্রচলন না থাকলেও হিন্দু সমাজে তা লক্ষ করা যায়। হিন্দু সমাজে দু'ধরনের গোত্রভিত্তিক পরিবার, যথা– বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যমান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যখন নিজের গোত্রের বাইরে বিবাহ করে তখন তাকে বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবার আবার দু'ধরনের হয়। উচু বর্ণের পাত্রের সাথে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আর নিচু বর্ণের পাত্রের সাথে উচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে বলে প্রতিলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার। এ ধরনের বিবাহের মূল কারণ সামাজিক অজাচার রোধ করা। আবার যখন কোনো ব্যক্তি নিজ গোত্রের মধ্যে যখন বিবাহ করে তখন তাকে অন্তর্গোত্র বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে। অন্তর্গোত্রভিত্তিক বিবাহ হিন্দু সমাজেই অধিক প্রচলিত। এ ধরনের বিবাহের পিছনে যুক্তি ছিল নিজ গোত্রের মধ্যে তথাকথিত রক্তের বন্ধন ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। বর্তমানে এ ধরনের পরিবার গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবার এ বর্ণপ্রথাকে কুসংস্কার মনে করে।

পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি

মানব সমাজে পরিবারের ভূমিকার পরিধি ব্যাপক এবং এর কার্যাবলি বহুমাত্রিক। সন্তান প্রজনন থেকে শুরু করে লালন–পালন এবং তার সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পৃথিবীর সকল দেশের পরিবার কাঠামোতেই এ ধরনের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে পরিবারের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটছে। তবে পরিবারের কতকগুলো মূল কাজ রয়েছে, যা বিশ্বের সব সমাজের পরিবার পালন করে থাকে। নিচে পরিবারের সাধারণ কতকগুলো কাজ আলোচনা করা হলো।

জৈবিক চাহিদা পূরণ

সমাজ স্বীকৃতভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার নর–নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য সন্তান প্রজনন এবং লালন–পালন করা। সন্তানের সুষ্ঠু লালন–পালন সন্তান প্রজননের আনুষঙ্গিক কাজ। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয়, ততদিন পরিবারের এই দায়িত্ব থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের ওপর সন্তানের সুষ্ঠু লালন–পালন নির্ভর করে।

সন্তানের ভরণ-পোষণ

সন্তানের ভরণ–পোষণের সাথে তার সামাজিকীকরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পিতা–মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের। এ সময় থেকেই শিশু অপরের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে শেখে। পারিবারিক মূল্যবোধ শেখে। পছন্দ–অপছন্দ বলতে পারে। পরিবারের বাইরের লোকের সাথে পরিচয় হয় এবং খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করে। শিশুকাল থেকে শিশু সমাজের রীতি–নীতি, আচার–ব্যবহার, নিয়ম–কানুন, অভ্যাস প্রভৃতি পরিবার থেকে শিক্ষালাভ করে। পারিবারিক সুন্দর পরিবেশেই শিশুর মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণ তৈরি হয়। পরিবার শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের প্রতিই যে শুধু দৃষ্টি রাখে তা নয় বরং তার মানসিক নিরাপত্তা এবং স্নেহ–ভালোবাসার দাবিও পূরণ করে। মানসিক নিরাপত্তাবোধ ব্যতিরেকে শিশুর মনে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশংকা সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত অবগত হব।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

পরিবার ছিল একসময়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রস্থল। তখন পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো গৃহেই উৎপাদন হতো। একসময়ে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের মধ্যেই এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজগুলো মিল, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এখন পরিবারের সদস্যরা অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করে। এজন্য পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়। তাছাড়া আমাদের দেশে গ্রামীণ কৃষি পরিবার কৃষি–অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। শুধু তা-ই নয়, পরিবারকে কেন্দ্র করে এদেশের কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে, যা আমাদের দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষাদান

পরিবার শিশুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। মাতাই শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। যদিও বর্তমানে শিক্ষা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবুও আচার-ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধি-বিধান, আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর শিক্ষা শিশু পরিবার থেকেই গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সব দায়-দায়িত্ব পালনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একসময়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে এ দায়িত্ব হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক প্রদান করে থাকে।

বিনোদনের ব্যবস্থা

অতীতে পরিবারের সদস্যদের অবসর, বিনোদন ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হতো। বর্তমানে যদিও বিনোদন ব্যবস্থায় নানা প্রযুক্তি, যান্ত্রিকতা এসেছে তথাপি মানসিক আনন্দের জন্য আজও পরিবারকেই সবচেয়ে বড়ো বিনোদন কেন্দ্র ধরা হয়ে থাকে। পারিবারিক আড্ডা একটি অকৃত্রিম বিনোদন ব্যবস্থা, যা পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

> **কাজ**
> দলগত : ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে পরিবারের ভূমিকার একটি তালিকা তৈরি কর।

সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংরক্ষণ

পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা প্রায় সকল সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা থেকে শুরু করে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। আর যেহেতু এই প্রজন্ম সৃষ্টির মূলে থাকে পরিবার, তাই সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, পরিবারের মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যৎ পিতা এবং মাতার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুণাবলি অর্জন করে। একই সাথে ভালোমন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা লাভ করে। তবে পৃথিবীর দেশে দেশে দেখা যায় যে পরিবারের ভেতরে লিঙ্গ ও বয়স ভেদে নানান বৈষম্য ও নিপীড়ন চালু থাকে। সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষার প্রধান সংস্থা হিসেবে পরিবার বৈষম্যমূলক প্রথা টিকিয়ে রাখারও অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে যা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবারের ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় পার্থক্য রয়েছে। একসময়ে গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যাই বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, ভোগবাদী মানসিকতাসহ নানা কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণও পরিবারের এ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। গ্রামে বর্ধিত পরিবার দেখা গেলেও শহরে এ ধরনের পরিবার নেই বললেই চলে। পিতৃপ্রধান ও পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থা শহর, গ্রামে উভয় স্থানেই দেখা যায়। তবে নয়াবাস পরিবার শহরে সর্বাধিক। একসময়ে এদেশের মুসলিম সমাজে বহুপত্নী পরিবারের সংখ্যা ছিল অধিক। এখন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। গ্রাম ও শহর উভয়েই এখন একপত্নী পরিবারের সংখ্যাই বেশি।

> **কাজ**
> একক : তোমার নিজ এলাকায় পরিবারের ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যার একটি তালিকা তৈরি কর।
> দলগত : শিক্ষা, বিবাহ, চিকিৎসা ও পরিবারের সদস্যদের অধিকারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকায় পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

আমাদের দেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে পরিবারের ধরনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন-আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষ কৃষি পেশা ছেড়ে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি শহরে চলে যাওয়ায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা সমস্যায় পতিত হচ্ছে। গ্রাম প্রধান আমাদের এদেশে এক সময়ে যৌথ কিংবা বর্ধিত পরিবারেই শিশু বড় হতো। তখন

অল্প বয়স থেকেই পারিবারিক পেশার সাথে এসব শিশু জড়িত হতো। পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর পেশা বেছে নেওয়ায় ভূমিকা রাখত । পরিবারের এ ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম বা শহর সবখানেই শিশুর সুন্দর জীবন গঠন ও তাদের অধিকার বিষয়ে পিতা–মাতা এখন অনেক সচেতন। শিশুশ্রম যে নিষিদ্ধ একথা অনেক অভিভাবকই জানেন।

পরিবার শিশুর আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য পিতামাতাকেই অধিক সচেতন হতে হয়। নৈতিকতার বীজ পারিবারিক মূল্যবোধ থেকেই শিশুর আচরণে বিকশিত হয়। আবার পিতা–মাতার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের এ ভূমিকা বর্তমানে প্রাক প্রাথমিক কিন্ডারগার্টেন কিংবা নার্সারি স্কুলগুলো গ্রহণ করছে। শহরে এ সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

সন্তান জন্মদান এবং প্রজননের ক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে শহরের পিতা–মাতা অধিক সচেতন।শহরের পিতা–মাতা দুইয়ের অধিক সন্তান নিতে চান না। গর্ভবতী মাকে সন্তান প্রসবে অদক্ষ দাইয়ের পরিবর্তে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে প্রেরণের ওপর গুরুত্ব দেন। পরিবারের ভূমিকার এ চিত্র গ্রাম ও শহরভেদে প্রায় একই। চিকিৎসা ক্ষেত্রে একসময় গ্রামের পরিবারগুলো কবিরাজ কিংবা হোমিও চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন এসব পরিবার সরকারি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছে। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে শহরের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই জানি।

পরিবারই ছিল একসময়ে ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে পিতা–মাতা, দাদা–দাদি ও অন্যান্য সদস্য বিভিন্নভাবে শিশুকে অবহিত করেন।

একসময়ে আমাদের দেশে আয়োজিত বিবাহ (settled or arranged marriage) প্রথার প্রচলন ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতের প্রাধান্য দেওয়া হতো। বর্তমানে এ প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিবাহ অনুষ্ঠানেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার এ পরিবর্তন গ্রাম ও শহরভেদে পার্থক্য বিদ্যমান। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক গ্রহণকে ঘৃণ্য প্রথা হিসেবে জানা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরে এ প্রথার প্রচলন এখনও লক্ষ করা যায়। তবে গ্রাম ও শহরের সচেতন পরিবারগুলো এখন বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছে। এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর উভয়েরই পরিবার কাঠামোতে নারী অধিকারের প্রতি পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরাও আজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেক সচেতন। তবে শিশু লালন পালন নারীর কাজ বলে মনে করা হয়। কিন্তু শিশু লালন পালনে পিতার অংশগ্রহন বাড়ছে নারী পরিবারের বাইরের কাজেও অংশ নিতে পারছে। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে নয়াবাস পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব পরিবারে বৃদ্ধ পিতা–মাতা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

বিদ্যালয় ও বিনোদন কেন্দ্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

একসময় আমাদের দেশে গ্রাম কিংবা শহরে জন্মগ্রহণকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যেমন– বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বহুমুখী প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের পরিবারের বোঝা ভাবা হতো। বর্তমানে পরিবারের এ মনোভাবে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উপরের চিত্রটির দিকে লক্ষ কর, এসব শিশুর জন্য

গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ে তারা পড়ালেখা করছে এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে তারা গান, নাচ ও খেলাধুলা করছে। আবার কোনো কোনো শিশু কারিগরি বিদ্যা ও হাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করছে। যার কারণে আমাদের দেশের অটিস্টিক শিশুরা আজ শিশু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসব শিশুর অধিকার বিষয়ে পরিবারের সদস্যগণ অধিক সচেতন। আমরাও বিশেষ চাহিদার ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন ও উপযোগী করে তুলব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু যাতে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরাপদভাবে নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ পায় এমন পরিবেশের ব্যবস্থা করব।

পরিচ্ছেদ ১৩.২ : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জন্মের পর মানবশিশু প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সদস্যের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এভাবে শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ, যেমন–খেলার সাথি, পাড়া–প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড়ো হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতি–নীতি, আচার–আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন একপর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের উপাদান

তোমার শ্রেণির একজন সহপাঠী বন্ধুর আচরণ মূলত অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজেও প্রভাবিত হও। আচরণগত এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে বলে মিথস্ক্রিয়া (interaction)। মানুষের সমাজ জীবনের মূল বিষয়ই হলো এই মিথস্ক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশে এ উপাদান তিনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সামাজিক পরিবেশ : যে বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিকশিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উপরও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রচলিত রীতি–নীতি, প্রথা–প্রতিষ্ঠান, বিধি–ব্যবস্থা, সকল প্রকার প্রবণতা, সমস্যা প্রভৃতি। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ নিয়েই আমাদের সামাজিক পরিবেশ গঠিত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশের অংশ। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নানাবিধ সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের নিজের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য। বাজার, জমিজমা, বাগান, গৃহপালিত পশু, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক

> **কাজ**
>
> দলগত : সামাজিক পরিবেশের সাংস্কৃতিক উপাদান চিহ্নিত কর এবং ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাবসমূহের একটি ছক তৈরি কর।
>
> একক : ব্যক্তিজীবনে সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহের প্রভাব চিহ্নিত কর।

পরিবেশের উপাদান। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মানুষের আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো সাংস্কৃতিক পরিবেশের অংশ।

মানুষের সৃষ্টি করা উপাদানসমূহ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠিত। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, আচার-আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। মানুষের সামাজিকীকরণে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবও গভীর। উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয় এবং মনের প্রসারতা বাড়ে।

ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের কারণে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃত। ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের পিছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বলা হয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ। এ পরিবেশও সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, যেমন– কম্পিউটার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রকৃতির উপাদানসমূহও মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

সমাজ জীবন : সমাজ জীবন সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের সমাজ জীবন মূলত কতকগুলো আচার–আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে, সে সমাজের জীবনধারা অর্থাৎ আচার–আচরণের সমষ্টিই হলো সমাজ জীবন। মানুষ সমাজের নানা কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এসব কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আচরণের সাথে মানুষ ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মানুষ অন্যের আচরণ অনুকরণ করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ অনুকরণ প্রবণতা থেকে মানুষ ভাষা, উচ্চারণ, কথা বলার ধরনসহ নানা বিষয় আয়ত্ত করে থাকে। সমাজ– সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জন্মদিন, বিয়ে, ঈদ, পূজা,বড়োদিন, বুদ্ধের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাজ জীবনের এসব অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। সমাজে বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা, ভাষার কয়েকটি বিধিমত রয়েছে। বৈচিত্রকে সম্মান জানানো ও সকলের অধিকার সকলে সমুন্নত রাখা সমাজ শাসনের লক্ষ্য।

সামাজিক মূল্যবোধ : মূল্যবোধ আমাদের সমাজবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবনধারার মান পরিমাপ করা যায় মূল্যবোধের মাধ্যমে। কেননা, মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি–ব্যবস্থা, আচার–ব্যবহার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তি আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা সমাজের মানুষের মনোভাব, প্রয়োজন ও ভালোমন্দের নীতিগত দিক যাচাই করা যায়।

মানুষ বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো শিখে থাকে। সমাজের সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটোদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো সকল সমাজেই রয়েছে। মানুষ সমাজ থেকে এ মূল্যবোধগুলো অর্জন করে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনধারার মাধ্যমে, যেমন– একজন বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় নাগরিকের মূল্যবোধ চীনাদের মূল্যবোধ থেকে পৃথক। বাংলাদেশি এবং ভারতীয়রা তাদের জীবনধারায় আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিকতা, অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরদিকে বৈষয়িক উন্নতি বা সমৃদ্ধিলাভই চীনাদের জীবনধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তির চিন্তা–চেতনা ও আচার–ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। বহু ধরনের সমাজ ও একই সমাজে বহু সমাজের উপস্থিতি থাকে। কতৃত্ব ধারণ ও বহু ধরনের মূল্যবোধ সম্মানও একটি দেশে কাম্য।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

মানব জীবনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করে।

সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয়। সমাজ জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কর্তৃত্ববান ব্যক্তিবর্গ, যেমন- বাবা-মা, বড় ভাই-বোন, শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হই। আবার সমপর্যায়ের বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও খেলার সাথি দ্বারাও প্রভাবিত হই। এক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখতে পাব বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাধ্যবাধকতার আর বন্ধুদের সাথে এ সম্পর্ক সহযোগিতার। এই দুই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা লাভ করি। এভাবে আমরা ছকে উপস্থাপিত পরিবার, প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সমাজ, স্থানীয় গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসি। এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ছক: সামাজিকীকরণের প্রতিষ্ঠান

পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা : পরিবার সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকেই। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। এ বিষয় আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে জেনেছি। যে ধরনের পরিবারেই আমরা বেড়ে উঠি না কেন, পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক জীবনের ভালো দিক এবং মন্দ দিক সবই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করছে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। আমরা সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো পরিবার থেকেই অর্জন করি। পরিবারের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো মা-বাবার মধ্যকার সম্পর্ক। মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আবার মা-বাবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, পারিবারিক গৃহস্থালীতে নারীর নিপীড়নও শিশুর মনে প্রভাব তৈরি করে তাকে বৈরি করে তুলতে পারে।

> **কাজ**
> একক : দীপা শহরের মেয়ে। তার সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব চিহ্নিত কর।
> দলগত : গ্রামের পরিবেশে বেড়ে উঠা আসমা। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তার সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ মা-বাবা। আবার মা-বাবা এ দুজনার মধ্যে অধিকতর কাছের হলেন 'মা'। স্বভাবতই সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে মা হতেই। মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন, শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ করা যাবে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, বর্ণ শিক্ষার কৌশল, ছড়া শিক্ষা অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফল থেকে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি।

আমাদের সমাজের কোনো কোনো পরিবারে বাবা উপার্জন করেন। আবার মা-বাবা উভয়েই উপার্জন করেন। সংসার পরিচালনায় তাদের অনেক নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে হয়। মা-বাবার আচরণ ও মূল্যবোধ শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশুর আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব মা-বাবার আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বেরই ফল। এভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নিকট আত্মীয়-স্বজনের আচরণও শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে। এসব বিষয় শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

> **কাজ**
> একক : শহর সমাজে সর্বত্র প্রতিবেশী দল গড়ে না উঠার কারণ চিহ্নিত কর।
> দলগত : 'শিশুর সামাজিকীকরণে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশী দলের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি' -যুক্তি দাও।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশী : নিজ পরিবার ব্যতীত যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারাই আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। যারা বাড়ির আশপাশে বসবাস করেন তারা হলো আমাদের প্রতিবেশী। শৈশব থেকেই ব্যক্তি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে বড়ো হতে থাকে। পরিবারের পরেই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর অবস্থান। শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পাশাপাশি বাড়িগুলোতে সমবয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবেশী দল গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী দল থেকে শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন– বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশগ্রহণ করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে ওঠে এবং সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সম্প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীর যে কোনো অনুষ্ঠানে পরিবারের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে, যেমন– জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি। আবার কেউ অসুস্থ হলে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে প্রতিবেশীই বেশি ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেশীই সুখ-দুঃখের প্রথম অংশীদার।

গ্রাম ও শহরভেদে প্রতিবেশীর সম্পর্ক ভিন্ন হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্পর্কে তেমন কৃত্রিমতা থাকে না। শহরে প্রতিবেশীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ নয়। তবে আনন্দ–উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেকটা আপন হয়ে যায়। প্রতিবেশীরাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজ স্বীকৃত আচরণ মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন ভালো প্রতিবেশী। তবে জমির মালিককে ও অন্যান্য কারনেও প্রতিবেশিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয় ও সহপাঠী : পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় ও সহপাঠীর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিশুরা কতকগুলো সামাজিক আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকে। এই আদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে–শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রভৃতি। শিশু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক, সহপাঠী, কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। এসব উপাদান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুমনে নেতৃত্ব, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, দেশপ্রেমবোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতিবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। সমাজের অনুমোদিত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয় থেকেই শেখে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীর আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভালো-মন্দের বিচারবোধ প্রভৃতিও শিশু বিদ্যালয় হতে শেখে। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের মূল্যবোধ ও আচরণ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

> **কাজ**
>
> দলগত : তোমাদের জীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধুদলের প্রভাব চিহ্নিত কর।
>
> একক : শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের প্রভাব চিহ্নিত কর।

শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথির ভূমিকা রয়েছে। এদের মাধ্যমেই সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়। এই সঙ্গী–সাথির মধ্যে কখনো কখনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুরা সমস্যার সমাধান ও দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল আয়ত্ত করে। খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথিদের মাধ্যমে শিশু নিজের আচরণের ভালো-মন্দ দিকের প্রশংসা বা সমালোচনা শুনতে পায়। এ ধরনের সমালোচনা থেকে শিশু সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শিক্ষা গ্রহণ করে। সমবয়সী শিশুদের আচার–আচরণ প্রায় একই প্রকৃতির। এদের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও রীতি-নীতি। এ কারণে সমবয়সী বন্ধুদলকে বলে 'অন্তরঙ্গ বন্ধুদল' (Peer Group)। শৈশব ও কৈশোরে এই সঙ্গী সাথি দলের পারস্পরিক আচরণিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। এ দলের প্রভাবে শিশু সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে। আবার সমাজের খারাপ দিকগুলোও গ্রহণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন হতে হবে।

স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় : স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় সামাজিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজের মধ্যে শিশু ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় সমাজ নির্দিষ্ট অঞ্চল ও স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে। এ সমাজের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, যা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ সমাজের মানবগোষ্ঠী, সামাজিক পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এছাড়া স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, আচরণ ব্যক্তির আচরণে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এই সমাজের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

স্থানীয় গোষ্ঠী : গোষ্ঠী বা দল হলো অনেক ব্যক্তির সমষ্টি, যাদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটা সাংগঠনিক কাঠামোতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত মানবগোষ্ঠীই হলো সামাজিক গোষ্ঠী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, সাংস্কৃতিক ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো সামাজিক গোষ্ঠীর শিশু পরিবার থেকে প্রতিবেশী দলে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পেরিয়ে স্থানীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী বা সংঘ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে। গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। শৈশব হতেই শিশু এসব গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের সদস্যদের সাথে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে; যা তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশু হয়ে ওঠে সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যপ্রেমী, ক্রীড়ামোদী ও বিজ্ঞানমনস্ক।

> **কাজ**
> দলগত : 'সম্প্রীতির শিক্ষা আমরা অর্জন করি জাতি-ধর্ম-বর্ণের সর্বজনীন ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণেরই মাধ্যমে।'-যুক্তি উপস্থাপন কর।
> একক : তোমার সামাজিকীকরণে নিজ ধর্মের ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব চিহ্নিত কর।
> একক : তোমার সামাজিকীকরণে যে কোনো স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রভাব চিহ্নিত কর।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে। শিশু-কিশোরেরা পরিবারে অন্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন-কুরআন শরিফ, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে। এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা- ইসলাম ধর্মের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশুমনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিশু মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারকে সংযত করে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে। শিশু-কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে। সম্প্রীতির শিক্ষা মনের সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে।

গণমাধ্যম : বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যান-ধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমই গণমাধ্যম। আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি। সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোরেরা এসব পাঠ করে মনের খোরাক

পূরণ করে। নিজেকে সমাজ–সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। জীবন–জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যান–ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। বেতার আমাদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করে। বেতারের মাধ্যমে আমরা সংবাদ, গান–বাজনা, নাটক–নাটিকা, শিক্ষামূলক আলোচনা, কথিকা, খেলাধুলা, আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হই। সুতরাং বেতার ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনে প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। সামাজিক ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। সামাজিক চলচ্চিত্রের অনেক চরিত্র ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন করে।

> **কাজ**
>
> একক : টেলিভিশনে প্রচারিত যে কোনো একটি অনুষ্ঠানের (যেমন– কৃষি সমাচার) প্রভাব চিহ্নিত কর।
>
> একক : শিশুর সামাজিকীকরণে শিশু–কিশোরদের উপর প্রচারিত একটি সংবাদের প্রভাব লেখ।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা নিউ মিডিয়ার উপস্থিতি ব্যাপক প্রভাব তৈরি করছে। যা দেশকে ও সকলের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। মোবাইলের ব্যবহার এই মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। এতে মোবাইলে আশক্তি ও একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেইজন্য সীমিত মোবাইল ব্যবহার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

গ্রাম ও শহর সমাজ মিলেই বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে। গ্রাম প্রধান দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ ঘটে গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রামীণ পরিবেশে শিশুর সামাজিকীকরণ ও শহরে পরিবেশের বেড়ে ওঠা শিশুর সামাজিকীকরণে পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– একক ও যৌথ পরিবার কাঠামো, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সহজ–সরল জীবনযাপন, জীবনযাত্রায় সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের প্রভাব প্রভৃতি। তাছাড়া এ সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় প্রতিবেশীসুলভ আচরণ, ধর্মীয় আচার–আচরণের প্রতি গভীর মনোযোগ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রক্ষণশীলতা এ সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রামের শিশু–কিশোরেরা এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশেই বড়ো হতে থাকে। ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া করে এ সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সাথে। এসব ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের শহর সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো: একক পরিবার কাঠামো, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি, জটিল সমাজ জীবন, শহরের সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব প্রভৃতি। পরিবেশের এরূপ বিভিন্ন উপাদানের সাথে ব্যক্তির আচরণিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসব কিছু ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

গ্রাম ও শহর সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কতকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। এ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে– পরিবার, প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গগোষ্ঠী, আত্মীয়–স্বজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন ও খেলাধুলার সংঘ প্রভৃতি।

গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই শিশু লালিত–পালিত হয় পরিবারে। পরিবারেই শিশুর শৈশব কাটে। স্বভাবতই পারিবারিক জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রভাব শিশুর পরবর্তী জীবনে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। উভয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি পরিবারের যে সাধারণ মনোভাব থাকে তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশুর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। শিশু পরিবারের মধ্যে কথা ও ভাষা শেখে, অনুকরণ করে পরিবারের সদস্যদের আচার–আচরণ, অঙ্গীভূত করে পরিবারের বিভিন্ন উপাদান। পরিবারের মাধ্যমেই সে নীতিবোধ, নাগরিক চেতনা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি শিক্ষা নিয়ে সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় পরিবেশেই প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশী দল রয়েছে। গ্রামের শিশু–কিশোর বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যা সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তবে শহরের পরিবেশে প্রতিবেশীর সাথে এরূপ সম্পর্ক দেখা যায় না। আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। এ অন্তরঙ্গ বন্ধু দলের মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল ও নীতিজ্ঞান লাভ করে থাকে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান শিশু–কিশোরেরা অন্তরঙ্গ বন্ধু দলের মধ্য থেকে অর্জন করে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠ্যবই এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পরিবারের গন্ডি অতিক্রম করে শিশু এক সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, স্বভাবতই তখন তার ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটে। এ বৃহত্তর পরিমন্ডলে তার ভূমিকা ও নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পরিবেশে বিকশিত হয় শিক্ষার্থীর নিজস্ব গুণাগুণ, যোগ্যতা ও ক্ষমতা। শিক্ষার্থীর ওপর বিদ্যালয় পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব শহর ও গ্রামভেদে পার্থক্য সূচিত হয়।

> **কাজ**
>
> দলগত: শিশুর জীবনে গ্রাম ও শহরভেদে বিদ্যালয়ের প্রভাবের তুলনা কর।
>
> শহর জীবনে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

বাংলাদেশের শহরে কিন্ডারগার্টেন, আন্তর্জাতিক স্কুল প্রি-ক্যাডেটসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে নানা কারণে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের ঘাটতি দেখা দেয়। খেলার মাঠের স্বল্পতা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটায় শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। তবে গ্রামের স্কুলগুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপাদানের ঘাটতি কম।

ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তিমাত্রই শিক্ষা অর্জন শেষে কোনো না কোনো পেশা বেছে নেয়। শহরের পেশাগত ক্ষেত্র গ্রাম থেকে আলাদা। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে এই উভয় পরিবেশে পার্থক্য সূচিত হয়। তাছাড়া গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, প্রথা–প্রতিষ্ঠান ও সমাজ কাঠামো। এসব কিছুই ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'পরিবার' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

২. আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃবাস পরিবার অধিক থাকার কারণ চিহ্নিত কর।

৩. অন্তর্গোত্র পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

৪. তোমার সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমার পরিবারের কার্যাবলির মধ্যে কোন কাজগুলো অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর।

৩. তোমার গ্রামে যে ধরনের পরিবার দেখা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

৪. 'ব্যক্তির সামাজিকীকরণে খেলার সাথির ভূমিকা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ' – বিশ্লেষণ কর।

৫. গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী দুই ছাত্রের সামাজিকীকরণের বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বামী–স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের ধরন কয়টি?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৬
ঘ. ৭

২. বাংলাদেশে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার কারণ হলো–

i. দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি
ii. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ
iii. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের ধরন নিচের কোনটি?

ক. ১ খ. ২ গ. ২ ও ৩ ঘ. ৩ ও ৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রোকসানা ও রহিমদের পরিবারে পাঁচজন সদস্য। রহিমই তার পরিবারের সকল কাজের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেন। অন্যদিকে ইদগ্রু ও মগ্রুর পরিবারেও পাঁচজন সদস্য। ইদগ্রুই তার পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত নেন।

৪. রোকসানা ও রহিমদের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার?

ক. মাতৃপ্রধান

খ. পিতৃপ্রধান

গ. একক

ঘ. বর্ধিত

৫. রোকসানার পরিবারের সাথে ইদগ্রু ও মগ্রুর পরিবারের ধরনের বৈশিষ্ট্যগত মিল কোথায়?

ক. আকারগত

খ. বংশমর্যাদাগত

গ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে

ঘ. উত্তরাধিকার সম্পর্কিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রিপা বিদিতার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। সে বিদিতার বাসায় আত্মীয়-স্বজনসহ বেড়াতে এলে বিদিতা তাদের যত্নসহকারে আপ্যায়ন করে। একদিন রিপা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রিপার বাবা-মা তখন বাসায় ছিলেন না। বিদিতার বাবা-মা রিপাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। রিকশা দুর্ঘটনায় বিদিতার পা ভেঙ্গে গেলে রিপা হাসপাতালে এক সপ্তাহ অবস্থান করে তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। বিদিতার জন্মদিনে রিপার পরিবার উপহারসহ বিদিতার বাসায় আসে।

ক. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার কয় ধরনের?

খ. পরিবারকে আয়ের একক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিদিতার আচরণে সামাজিকীকরণের কোন উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শহুরে জীবনে প্রতিবেশীরাই ঘনিষ্ঠজন-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. তাহসান ও মাহি একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। বিয়ে করে তারা একসাথে একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। তাহসান ও মাহির একমাত্র সন্তান মুনা গৃহপরিচারিকার সাথেই সময় কাটায়। মাহি ও তাহসান কাজ শেষে যখন বাসায় ফেরেন, মুনা তখন ঘুমিয়ে থাকে। আবার তারা যখন কর্মস্থলে যান মুনা তখনও ঘুমিয়ে থাকে। বাবা-মা কেউ মুনাকে সময় দিতে পারেন না। কিছুদিন পর তাহসান ও মাহি লক্ষ করেন মুনার কথা ও আচরণ অনেকটা গৃহপরিচারিকার মতো। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব হয়। একে অপরকে দোষারোপ করেন। তাহসান বলেন,'মা-ই সকল শিশুর জীবনাদর্শ।' উত্তরে মাহি বলেন, 'সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব সমান।'

ক. গণমাধ্যম কী?

খ. 'সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া' – ব্যাখ্যা কর।

গ. মুনার আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটনায় বর্ণিত পরিবারটির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাহির উক্তিটি অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।